ইউনিট ১ **অধিবেশন ১**

কম্পিউটার পরিচিতি ও পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত দিক থেকে অন্যান্য শাখার তুলনায় কম্পিউটারের অগ্রগতি এবং প্রসার অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী! এ অগ্রগতির পিছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী ও গবেষকের নিরলস প্রচেষ্ঠা। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম্পিউটার মূল উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশত অব্দে গণনা যন্ত্র আবিষ্কারের পর হতে প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে বর্তমানে ডিজিটাল কম্পিউটারও আবিষ্কৃত হয়েছে। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এ কম্পিউটার মানুষকে খুব আকর্ষণ করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার বেড়ে চলেছে। কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার এখন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটারের সংগে তথ্যের অবাধ আদান প্রদান সম্ভব হয়েছে। ফলে ভৌগলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখার গন্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র মানব জাতিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে একত্রিত করেছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ ও কম্পিউটার পরিচালনা ও দক্ষতা অর্জন করা এবং এর প্রযুক্তির ব্যবহার শেখা প্রয়োজন। প্রিয় শিক্ষার্থী! আমরা নিচের পর্বগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- কম্পিউটার সম্বন্ধে পরিচিতি লাভসহ কম্পিউটার পরিচালনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কম্পিউটারের অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কম্পিটারের কাজ কী তা নিরূপন করতে পারবেন এবং কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ শিখতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ কম্পিউটার পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী! কম্পিউটার ইলেকট্রিক প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। Computer শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে উৎপত্তি। Comput শব্দ থেকেই Computer শব্দটির উৎপত্তি। যার আভিধানিক অর্থ হলো **গণনাকারী যন্ত্র**। কম্পিউটার হলো বিভিন্ন গাণিতিক ও যুক্তিমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটার দিয়ে মূলত গাণিতিক যুক্তি ও শিক্ষামূলক কাজ করা যায়। কম্পিউটারের নিজস্ব কোন চিন্তা-চেতনা, শক্তি বা বুদ্ধি নেই। মানুষের দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী এ যন্ত্র কাজ করে। ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ ১৮৩৩ সালে কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। তবে জন ভন নিউম্যান-এর নাম আধুনিক কম্পিউটারের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃত।

চার্লস ব্যাবেজ

চার্লস ব্যাবেজ (১৭৯১-১৮৭১): ১৭৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের টেইগমাউথ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১০ সালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৮১৭ সালে কেমব্রিজ থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৮২৭ সালে ১ থেকে ১০৮০০০ পর্যন্ত লগারিদম সারণি প্রকাশ করেন। চার্লস ব্যাবেজ এনালিটিক্যাল ইন্‌জিনের উপর কাজ শুরু করেন ১৮৩৩ সালে এবং পরে কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। ১৮৭১ সালে তিনি লন্ডনে মারা যান।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন এখন নিচের ছক পূরণ করি।

১ চার্লস ব্যাবেজ কে? তিনি কত সালে এবং কী আবিষ্কার করেন?	
২। কম্পিউটার কোন্ শব্দ থেকে উৎপত্তি?	
৩। কম্পিউটারের আভিধানিক অর্থ কী?	

পর্ব-খ ঃ কম্পিউটারের অংশসমূহ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! সাংগঠনিক দিক বিবেচনায় একটি কম্পিউটারকে পাঁচ অংশে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) কম্পিউটারের একটা গ্রহণ মুখ (Input) থাকে। যে দিক দিয়ে তথ্য বা ডেটা প্রবেশ করানো হয়ে থাকে।

খ) কম্পিউটারের একটা নির্গমন মুখ (Output) থাকে, যেদিক দিয়ে তথ্য বা ডেটা আমাদেরকে দেখাবে।

গ) কম্পিউটারের গাণিতিক ও যুক্তি নির্ণয় কেন্দ্র বা Arithmetic and Logical Unit থাকে যেখানে গাণিতিক এবং যুক্তি নির্দেশাবলী সম্পাদিত হয়।

ঘ) একটা স্মৃতি কেন্দ্র বা Memory Unit আছে যেখানে প্রবিষ্ঠ তথ্য বা ডেটা কম্পিউটার সংরক্ষণ করে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! Control Unit ও Arithmetic Logical Unit একত্রে একটা Microchip-এর ভিতরে তৈরি করা হয়েছে এবং এ Microchip-কে Central Processing Unit বা CPU বলা হয়। এটাকে কম্পিউটারের Brain বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন এখন নিচের ছক পূরণ করি।

১। কম্পিউটারের অংশগুলো কী কী?	
২। কম্পিউটারের কোন্ অংশকে ব্রেন বলা হয়?	
৩। নির্গমণ মুখের কাজ কী?	
৪। তথ্য কোথায় সংরক্ষিত থাকে?	

ব্যবহারিক কাজ ০১ : কম্পিউটারের প্রধান অংশসমূহ সনাক্তকরণ ও পর্যালোচনা।

পর্ব-গ ঃ কম্পিউটারের কাজ ও কম্পিউটারের প্রকার ভেদ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন কম্পিউটার কি কাজ করে তা জেনে নেই। কম্পিউটার নিচের চারটি গুরুতপূর্ণ কাজ করে। যেমন-

- কোন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত প্রোগ্রাম কম্পিউটার গ্রহণ করে, মেমরিতে সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্বাহ করে।

- কীবোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ডিস্ক, সিডি, পেনড্রাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ডেটা বা তথ্য গ্রহণ করে।
- ডেটা বা তথ্য প্রসেস করে এবং
- মনিটর, প্রিন্টার, ডিস্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ফলাফল বা তথ্য প্রকাশ করে বা ছাপায়।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আধুনিক কম্পিউটারকে প্রয়োগ ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে প্রধানত দুই ভাগে ভাগে করা হয়েছে। যেমন-

- সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার
- বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটার

একটি সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম সংরক্ষিত থাকে। এ কম্পিউটারে নতুন প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যায় এবং পুরাতন প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা বা মুছে ফেলা যায়। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী কাজের উপযোগী কম্পিউটারের অংশ বিশেষ ব্যবহার করার অথবা কোন বিশেষ অংশ সংযোজন বা সংশোধন করার সুবিধা পায়।

অন্য দিকে বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটারকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয়। এ কম্পিউটারে সুনির্দিষ্ট একটি প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা থাকে। এমনকি বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটারের প্রয়োগ পরিধি সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ, মহাসমুদ্রে সাবমেরিনের দিক নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটারের কথা উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! ডেটা গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ পরিচালনা নীতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

- এনালগ কম্পিউটার
- ডিজিটাল কম্পিউটার
- হাইব্রিড কম্পিউটার

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন এখন নিচের ছক পূরণ করি।

১। কম্পিউটার দিয়ে মূলত কী ধরনের কাজ করা হয়?	
২। কম্পিউটার কত প্রকার?	
৩। ডিজিটাল কম্পিউটার কত প্রকার ও কী কী?	

পর্ব-ঘ ঃ পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

কম্পিউটারের কতগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মানুষকে কম্পিউটার ব্যবহারে আকৃষ্ট করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হল: নির্ভুল কর্মসম্পাদন, দ্রুতগতি, মেমরি, সূক্ষ্মতা, যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত, স্বয়ংক্রিয় কর্মক্ষমতা এবং সহনশীলতা।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন আমরা নিচের কাজ সম্পন্ন করি।

১। কম্পিউটার পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

কম্পিউটার এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার কী ?

কম্পিউটার হলো গণনাকারী যন্ত্র। এক কথায় বলতে গেলে কম্পিউটার হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা দিয়ে গাণিতিক ও যুক্তিমূলক সমস্যা সমাধান করা যায়। এ যন্ত্র যোগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি গাণিতিক কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ও নির্ভুলভাবে করতে পারে। তাছাড়া যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজও কম্পিউটার নির্ভরতার সাথে করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটারের নিজস্ব কোন চিন্তা-চেতনা, শক্তি বা বুদ্ধি নেই। মানুষের দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী এ যন্ত্র কাজ করে। কম্পিউটারের তথ্য গ্রহণ, তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও তথ্য উপস্থাপনের ক্ষমতা রয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটার বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজকের এ উন্নত অবস্থানে এসেছে। কম্পিউটারের এ পরিবর্তন বা বিকাশের এক একটি ধাপকে প্রজন্ম বলা হয়। প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের সময়কাল হলো ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সাল। তখন ভ্যাকুম টিউব বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক বর্তনী ব্যবহৃত হতো এবং আকারে বড় ছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের ব্যাপ্তিকাল ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ সাল। এ সময় কম্পিউটারে ট্রানজিস্টারের ব্যবহার শুরু হয়। আকার ছোট হতে থাকে। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের সময় কাল ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল। এ সময় কম্পিউটারে একীভূত বর্তনী বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) ব্যবহৃত হয়। আকৃতি সংকোচনসহ উচ্চতর ভাষার প্রচলন শুরু হয়।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের সময় কাল ১৯৭১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এ সময় কালেই মাইক্রো কম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার প্রচলন হয়। বৃহদাকার একীভূত বর্তনী (VLSI) সংযোজন এবং মাইক্রোপ্রসেসর-এর প্রসার ও প্রচলন হয়। সরাসরি ব্যবহারের জন্য প্রোগ্রাম প্যাকেজের ব্যাপক প্রচলন হয়।

এছাড়াও শিক্ষার্থী বন্ধুরা! পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার রয়েছে যাকে কম্পিউটারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলা যায়। এখানে অধিক সমৃদ্ধশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহৃত হবে। নিজস্ব বিচার বুদ্ধি, শিক্ষা গ্রহণে মতামত থাকবে এবং কণ্ঠস্বর বোঝাতে পারবে। অত্যাধুনিক সফটওয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটার একজন পরামর্শকের (যেমন- ডাক্তার, শিক্ষক) ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র: একটি মাইক্রো কম্পিউটার।

কম্পিউটারের কাজ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন কম্পিউটার কি কাজ করে তা জেনে নেই। কম্পিউটার নিচের চারটি গুরুতপূর্ণ কাজ করে; যেমন-

- কোন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত প্রোগ্রাম কম্পিউটার গ্রহণ করে, মেমরিতে সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্বাহ করে।
- কীবোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ডিস্ক, সিডি, পেনড্রাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ডেটা বা তথ্য গ্রহণ করে।
- ডেটা বা তথ্য প্রসেস করে এবং
- মনিটর, প্রিন্টার, ডিস্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ফলাফল বা তথ্য প্রকাশ করে বা ছাপায়।

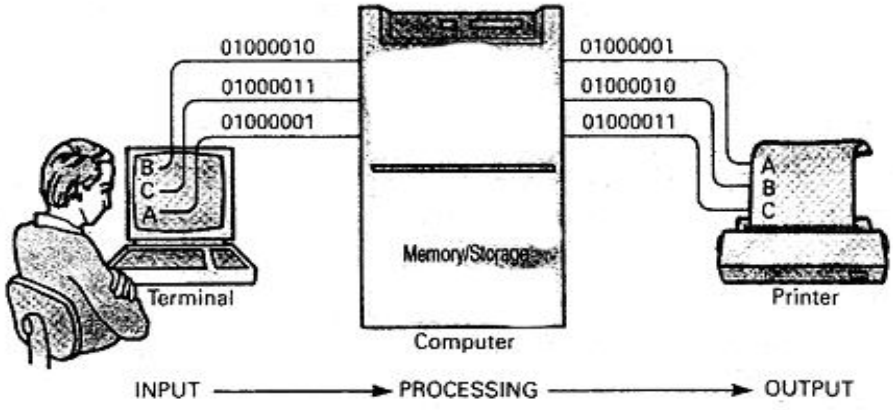

চিত্র: কম্পিউটারের সাহায্যে কাজের প্রক্রিয়াকরণ।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আধুনিক কম্পিউটারকে প্রয়োগ ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে প্রধানত দুই ভাগে ভাগে করা যায়; যেমন-

- সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার ও
- বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটার।

একটি সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম সংরক্ষিত থাকে। এ কম্পিউটারে নতুন প্রোগ্রাম সংক্ষণ করা যায় এবং পুরাতন প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা বা মুছে ফেলা যায়। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী কাজের উপযোগী কম্পিউটারের অংশ বিশেষ ব্যবহার করার অথবা কোন বিশেষ অংশ সংযোজন বা সংশোধন করার সুবিধা পায়।

অন্য দিকে বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটারকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয়। এ কম্পিউটারে সুনির্দিষ্ট একটি প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা থাকে। এমনকি বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটারের প্রয়োগ পরিধি সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ মহাসমুদ্রে সাবমেরিনের দিক নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটারের কথা উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! ডেটা গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ পরিচালনা নীতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন-

- এনালগ কম্পিউটার,
- ডিজিটাল কম্পিউটার ও
- হাইব্রিড কম্পিউটার।

এনালগ কম্পিউটার

এনালগ কম্পিউটার পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! এটি মূলত পদার্থ বিজ্ঞানের নীতির ভিত্তিতে গঠিত একটি পরিমাপক যন্ত্র। চাপ, তাপ, তরলের প্রবাহ ইত্যাদি পরিবর্তনশীল ডেটার জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে এনালগ কম্পিউটারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের কম্পিউটার পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ থেকে ডেটা বুঝে নিয়ে প্রক্রিয়াকরণ কাজ সম্পন্ন করে। তেল শোধনাগারে তরলের প্রবাহ ও তাপমাত্র পরিমাপের জন্য এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

ডিজিটাল কম্পিউটার

ডিজিটাল কম্পিউটার ডেটা হিসেবে বর্ণ, সংখ্যা ও কিছু বিশেষ প্রতীক গ্রহণ করে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মূলত এটি গণিতের নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত একটি গণনা যন্ত্র। এ কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল সরাসরি লিখিতভাবে পাওয়া যায়। ডিজিটাল কম্পিউটার খুবই সূক্ষ্ম ও নির্ভুল ফলাফল দিতে সক্ষম। সাধারণত কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকেই বুঝায়।

হাইব্রিড কম্পিউটার

এনালগ ও হাইব্রিড উভয় কম্পিউটারে কাংক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে হাইব্রিড কম্পিউটার তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটারের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এনালগ অংশ রোগীর হার্টের কার্যাবলী, তাপমাত্র এবং অন্যন্য জরুরী অবস্থা পরিমাপ করে। তারপর এটা পরিমাপক তথ্য সংখ্যায় রূপান্তর করে ডিজিটাল অংশে প্রাপ্ত ডেটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রোগীর অবস্থা পর্যালোচনা করে। কোন অস্বাভাবিক অবস্থা নির্ণয় হওয়া মাত্রই ডিজিটাল অংশ তা নার্স বা ডাক্তারকে জানিয়ে দেয়। হাইব্রিড কম্পিউটারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ের জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার আকার, কর্মদক্ষতা, গতি, সংরক্ষণ ক্ষমতা, ব্যবহার উপযোগীতা, মূল্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে চার ভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

- সুপার কম্পিউটার,
- মেইন ফ্রেম কম্পিউটার,
- মিনি কম্পিউটার ও
- মাইক্রোকম্পিউটার।

সুপার কম্পিউটার ঃ সবচেয়ে শক্তিশালী ও অত্যান্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটার হলো CRAY-1, CYBER-250, SupperXII।

মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ঃ ক্ষমতা ও আকার বিচারে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার তুলনায় ছোট কিন্তু প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা এবং মেমরি ধারণ ক্ষমতা অত্যান্ত বেশি। IBM4341, NCR, N8370, IBM Amdah1580, UNIVAC 1100, CYBER 170 উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মিনি কম্পিউটার ঃ আকার ছোট ও কম ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার। NOVA-3 PDP11, IBM-S/400, NCR S/9290, IBM S/36, IBM S/34 উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মাইক্রোকম্পিউটার ঃ আকার ও ক্ষমতা বিচারে সুপার কম্পিউটার তুলনায় ছোট কম্পিউটার। কিন্তু একীভূত বর্তনীর মাইক্রোপ্রোসেসর সংযুক্ত। এ কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলা হয়। IBM386, MACINTOSH, IBM Pentium উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে দেশে আমরা যে সব কম্পিউটার ব্যবহার করি তা সবই প্রায় মাইক্রোকম্পিউটার।

আবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মাইক্রোকম্পিউটারের আধুনিক সংযোজন হচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার, নোটবুক কম্পিউটার।

কম্পিউটারের মূল অংশ এবং কম্পিউটারের উপকরণাদি

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! সাংগঠনিক দিক বিবেচনায় একটি কম্পিউটারকে পাঁচ অংশে ভাগ করা যায়; যেমন-

ক) কম্পিউটারের একটা গ্রহণ মুখ (Input) থাকে। যে দিক দিয়ে তথ্য বা ডেটা প্রবেশ করানো হয়ে থাকে।

খ) কম্পিউটারের একটা নির্গমন মুখ (Output) থাকে, যেদিক দিয়ে তথ্য বা ডেটা আমাদেরকে দেখাবে।

গ) কম্পিউটারের গাণিতিক ও যুক্তি নির্ণয় কেন্দ্র বা Arithmetic and Logical Unit থাকে যেখানে গাণিতিক এবং যুক্তি নির্দেশাবলী সম্পাদিত হয়।

ঘ) একটা স্মৃতি কেন্দ্র বা Memory Unit আছে যেখানে প্রবিষ্ঠ তথ্য বা ডেটা কম্পিউটার সংরক্ষণ করে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! Control Unit ও Arithmetic Logical Unit একত্রে একটা Microchip-এর ভিতরে তৈরি করা হয়েছে এবং এ Microchip-কে Central Processing Unit বা CPU বলা হয়। এটাকে কম্পিউটারের Brain বলা হয়ে থাকে। কম্পিউটারের মূল অবকাঠামো নিম্নরূপে দেখান যায়।

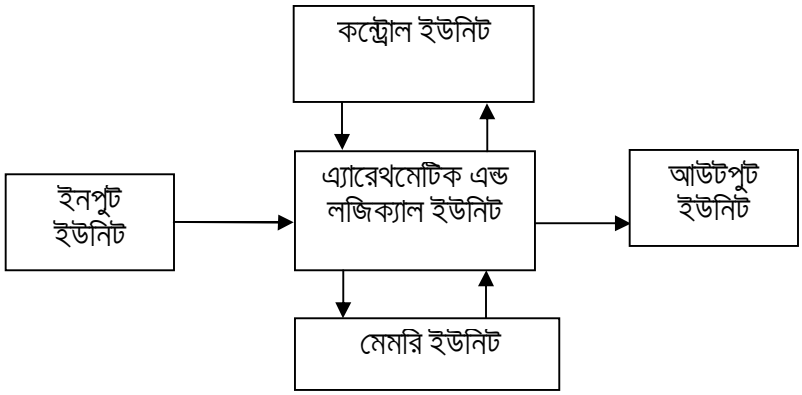

চিত্র : কম্পিউটারের মূল কাঠামো।

আবার একটা কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো নিম্নরূপ দেখাবে।

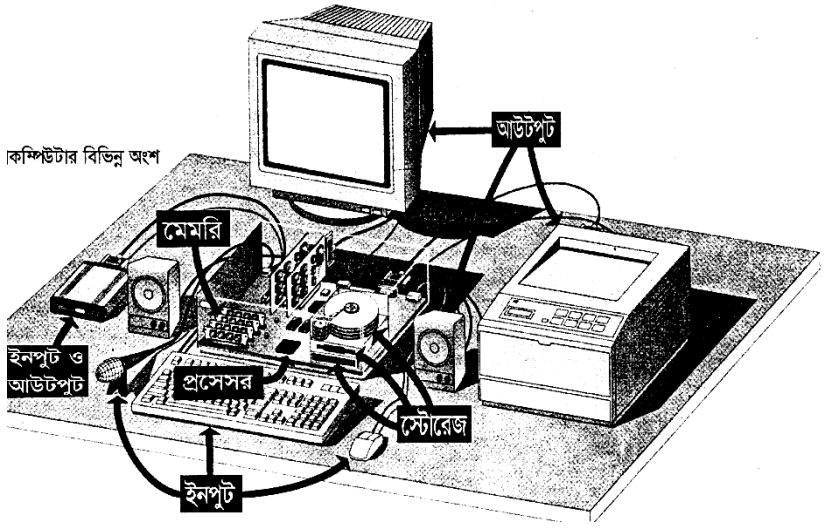

চিত্র : কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনারা বাহ্যিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে কম্পিউটারের নিচের অংশগুলো দেখতে পাবেন।

সিস্টেম ইউনিট : একটা Personal Computer-এর সবচেয়ে বড় অংশকে System Unit বলে। এ Unit-এর ভিতরেই সি পি ইউ (Central Processing Unit), স্মৃতিকেন্দ্র (Memory Unit), সমস্ত যন্ত্রাংশ, ফ্লপি, সিডি, ডিস্ক ড্রাইভ ও হার্ডডিস্ক অবস্থিত। এখানে রিসেট (Reset) বোতাম থাকে এবং সিস্টেম ইউনিটকে তালা চাবি লাগানোর ব্যবস্থাও থাকে। আমরা হার্ডডিস্ককে বাইরে থেকে দেখতে পারি না। মনিটরের নিচে অথবা পাশে দাঁড় করানো থাকে। এ বাক্সটির ভিতরেই কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশ সংযোজিত থাকে। এ সিষ্টেম ইউনিট এর ভিতরেই কম্পিউটারের মাদার বোর্ডসহ অন্যান্য অংশসমূহ বিদ্যমান। মাদার বোর্ডই হচ্ছে

একটি কম্পিইটারের মূল অংশ যা আপনি ব্যবহার করার সময় দেখতে পান না। এটা সিস্টেম ইউনিট এর অভ্যন্তরে থাকে। মাদার বোর্ডের মধ্যেই কম্পিউটারের CPU বা মাইক্রোপ্রসেসর থাকে যা কম্পিউটারের ব্রেন বা কেন্দ্রিয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ হিসেবে পরিচিত। আজকাল নতুন কম্পিউটারগুলোতে মাদার বোর্ডের সাথেই কিবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ ও হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ লাগানোর ব্যবস্থা আছে।

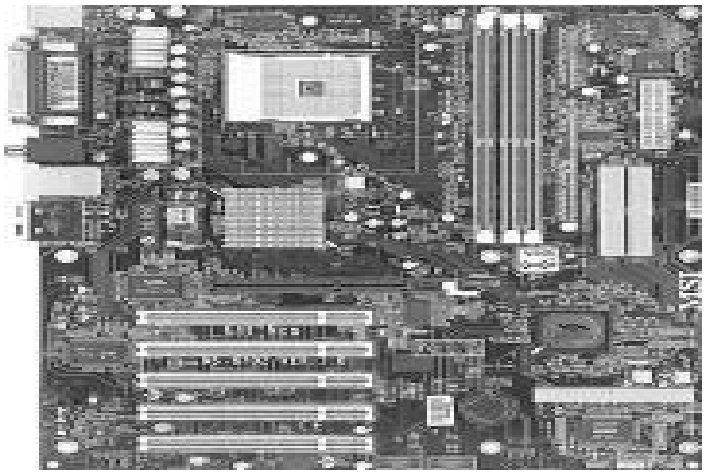

চিত্র: একটি মাদার বোর্ড।

একটি মাদারবোর্ড-এ সিপিউ, RAM চিপসমূহ (SIMM/DIMM), ROM চিপ (BIOS), DMA চিপ (Direct Memory Access), PIC চিপ (Programmable Intrupt Controller), PIT চিপ (Programmable Intrupt Timer), Expansion slotসমূহ ও DPI, কীবোর্ড সংযোগ পোর্ট, পাওয়ার সাপ্লাই পোর্ট, বিভিন্ন Jumper connection ও LED connection ইত্যাদি উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকে।

মনিটর : টেলিভিশনের পর্দার মত দেখতে এবং যেখানে সকল লেখা বা তথ্য ভেসে ওঠে সে উপকরণই মনিটর হিসেবে পরিচিত।

কিবোর্ড : যে উপকরণের সাহায্যে আমরা ডেটা বা তথ্য টাইপ করি তাকে "কিবোর্ড" (Keyboard) বলে। আর কিবোর্ড-কে আমাদের সুবিধার জন্য অবিকল আধুনিক টাইপ মেশিনের মতো করা হয়েছে, যাতে করে একজন টাইপ জানা ব্যক্তি অতি সহজেই কম্পিউটারে তথ্য প্রবেশ করানোর কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। ইংরেজি টাইপ রাইটার-এর মতো এবং কিছু অতিরিক্ত চাবি (Key) নিয়ে একটি কিবোর্ড গঠিত। একটি আধুনিক কীবোর্ডে মোট ১১২টি Key থাকে।

মাউস : বর্তমানে উইন্ডোজ চালিত সফটওয়্যারসমূহ কিবোর্ড -এর পাশাপাশি মাউস দিয়ে চালনা করা সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করতে সহায়তা করে। মাউস হাতের মুঠোর মধ্যে ধরার মতো একটি যন্ত্রাংশ যা একটি মাউস প্যাডের উপর রেখে ব্যবহার করতে হয়। ইঁদুরের চলার গতির সাথে মিল থাকায় উপকরণটি মাউস নামকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মোট কথা একটি কম্পিউটারের প্রধান অংশগুলো হল সিপিউ, মনিটর, কীবোর্ড বা মাউস এবং প্রিন্টার।

মনিটরের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মনিটর দু'রকমের হতে পারে। সাদাকালো বা Monochrome (অর্থাৎ এক রঙা) এবং রঙিন। বর্তমানে রঙিন মনিটরই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে মূল্যমান কমে যাওয়ায় ব্যবহারকারীগণ খুব অল্প টাকাতেই উঁচুমানের মনিটর কিনতে পারছেন। মনিটরের বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো-

ক) রেজুল্যুশন (Resolution) : একটা মনিটর-এর রেজুল্যুশন যত বেশি, মনিটরটি তত ভালো, অর্থাৎ ঐ মনিটরের অক্ষর বা চিত্র তত পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট দেখাবে। মনিটরের পর্দাকে আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বি অনেকগুলো রেখায় ভাগ করা হয়। আর ঐ ভাগকে রেজুল্যুশন বলে। যেমন- 640x480, 1024x764, ইত্যাদি।

খ) পিচ বা পিক্সেল (Pitch or Pixel) : একটি আড়াআড়ি এবং একটি লম্বালম্বি রেখার Cross – Section এর diameter-কে পিক্সেল বা পিচ বলে। পিক্সেল যত কম হবে, মনিটর তত ভালো হবে। অন্যদিকে পিক্সেল রেজুল্যুশনের বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমানে ০.২৮ মিলিমিটার পিক্সেলের মনিটর ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ) **নন-ইন্টারলেস্ড :** এটা মনিটরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। টেলিভিশনের ছবি চোখে দৃশ্যমান এবং গতিময় রাখার জন্য প্রতিটি ছবিকে ফ্রেম হিসেবে পাঠানো হয়। একটা ফ্রেমে ২৫টি লাইন থাকে। গতিময়তা দেবার জন্য এক ফ্রেমকে অন্য ফ্রেমের উপর ১,৩,৫,৭ ও ২,৪,৬,৮ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়। এ ব্যবস্থাকে ইন্টারলেসিং বলে। কম্পিউটারের কার্যগতি টেলিভিশনের ফ্রিকোয়েন্সীর চাইতে অনেক অনেক বেশি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মনিটরের চিত্র নন-ইন্টারলেসড থাকা ভাল। ফলে চোখ ভাল থাকবে ও দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) **মাল্টি ফ্রিকোয়েন্সীঃ** এ বৈশিষ্ট্য থাকলে মনিটরটি অক্ষর প্রদর্শনের সময় এক সফটওয়্যার থেকে অন্য সফটওয়্যার-এ পরিবর্তনের কারণে চিত্র ও লেখা একই সংগে দেখানোর সময় কম্পমান হবে না এবং চোখের উপর কোন বাড়তি চাপ পড়বে না।

ঙ) **লো-রেডিয়েশন :** বর্তমানে ব্ল্যাক ট্রিনিট্রন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে মনিটরের পর্দাকে এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে ভিতরের ইলেকট্রনসমূহ বাইরে যথাসম্ভব না বেরিয়ে পর্দায় লেখার উজ্জ্বলতা বাড়াবে আর সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

কম্পিউটার পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কম্পিউটারের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দ্রুতগতি (High speed)

কম্পিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কাজ করে। কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি গণনাও করতে পারে। কম্পিউটারের এ দ্রুতগতি সম্পন্ন গণনার কাজকে মিলিসেকেন্ড, মাইক্রোসেকেন্ড, ন্যানোসেকেন্ড, পিকোসেকেন্ড ইত্যাদি সময়ের একক হিসেবে ভাগ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সাধারণ একটি যোগ করতে কম্পিউটারের সময় লাগে ৫০ ন্যানোসেকেন্ড তাহলে কম্পিউটার একসেকেন্ডে এরকম দু'কোটি যোগ করতে পারবে। একজন মানুষের ১০০ বৎসরের কাজ একটি সাধারণ কম্পিউটার ১ ঘন্টায় করতে সক্ষম।

বিশ্বাস যোগ্যতা (Reliability)

কম্পিউটার নির্ভুলভাবে কাজ করে। উন্নত প্রযুক্তির কারণে কম্পিউটার সর্বদা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম দিয়ে নির্দিষ্ট কাজ পুরোপুরি নির্ভুলভাবে করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ও ডেটাকে অবশ্যই ১০০% শুদ্ধ হতে হবে। ভুল ফলাফল দেয়াকে গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট (Garbage in garbage out) বলা হয়। আধুনিক কম্পিউটার প্রমাণ করছে যে মানুষ ভুল করে, কিন্তু কম্পিউটার ভুল করে না।

সূক্ষ্মতা (Accuracy)

কম্পিউটারে প্রাপ্ত ফলাফলের সুক্ষ্মতা অতুলনীয়। গণনার সূক্ষ্মতা অত্যন্ত বেশি অর্থাৎ গাণিতিক হিসেবের ক্ষেত্রে অনেক দশমিক স্থান পর্যন্ত ফলাফল দিতে সক্ষম।

ক্লান্তিহীনতা (Dilligence)

দীর্ঘক্ষণ একটানা কাজ করলেও কম্পিউটার ক্লান্ত হয় না বা গণনায় ভুল করে না। পুনরাবৃত্তি মূলক কাজ নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে কম্পিউটারের উৎসাহ, মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার একটুও ঘাটতি হয় না।

স্মৃতি বা মেমরি (Memory)

কম্পিউটারের স্মৃতি অতি বিশাল, কোটি কোটি ডেটা ও নির্দেশ তাতে জমা রাখা যায়। কম্পিউটারের সঞ্চয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অতি সহজে একই ধরনের কাজ বিভিন্ন সময় দ্রুতগতিতে করা সম্ভব। এর মেমরি অনেক ডেটা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়ভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। প্রয়োজনের সময় যে কোন ডেটা বা নির্দেশ কম্পিউটার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও নির্ভুলভাবে স্মরণ করতে পারে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মেমরি থেকে কোন ডেটা খুঁজে বের করতে কম্পিউটারের সময় লাগে ১ ন্যানোসেকেন্ড।

যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত (Logical decision)

কম্পিউটার কোন রকম মৌলিক চিন্তা শক্তির অধিকারী নয়। বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্নের পাশাপাশি কম্পিউটার লজিক প্রক্রিয়াও করতে পারে।

বহুমুখীতা (Versatility)

বর্তমান কম্পিউটার জটিল কাজ সম্পন্ন করার এক শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সাধারণ হিসাব নিকাশ থেকে শুরু করে জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান পর্যন্ত সকল কাজেই কম্পিউটার মানুষকে সাহায্য করতে পারে।

স্বয়ংক্রিয়তা (Automation)

কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। কম্পিউটার পরস্পর নির্ভরশীল পর্যায়গুলোর কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে থাকে অর্থাৎ প্রদত্ত নির্দেশমত কম্পিউটার ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসসমূহ

কম্পিউটারে তথ্য প্রবিষ্ট করানোর কাজে ব্যবহৃত এবং বহিমুখে তথ্য বা উপাত্ত ছাপানো কাজের জন্য ব্যবহৃত উপাকরণাদি দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ইনপুট ডিভাইসসমূহ বা উপকরণাদি এবং আউটপুট ডিভাইসসমূহ বা উপকরণাদি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! নিচে এগুলো সম্পর্কে আমরা এখন পরিচিত হব।

ক) ইনপুট ডিভাইস

কম্পিউটারের অভ্যন্তরে যে যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ (উপকরণাদি) দ্বারা তথ্য, উপাত্ত প্রবিষ্ট করানো হয় তাই হলো ইনপুট ডিভাইস। যেমন :- পাঞ্চকার্ড, কী বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ফ্লপি-ডিস্ক ড্রাইভ, সিডি, পেন ড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ ইত্যাদি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! বহুল ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইস হলো কী বোর্ড এবং মাউস।

খ) আউটপুট ডিভাইস

কম্পিউটারের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত কাংখিত নির্দেশমত সম্পাদিত হওয়ার পর যে যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ দ্বারা বর্হিজগতের বোধগম্য ও দৃশ্যমান করা হয় তাই হলো আউটপুট ডিভাইস। যেমন:- মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, টেপ ড্রাইভ ইত্যাদি। তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মনিটর এবং প্রিন্টারই বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইস।

মূল্যায়নঃ

অধিবেশন ১

১। কম্পিউটার কী?

২। একটি কম্পিউটার কোন কোন উপকরণ নিয়ে গঠিত ?

৩। কী বোর্ডে সকল কী গুলোর নাম খাতায় লিখুন।

৪। কম্পিউটারের ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসগুলোর নাম খাতায় লিখুন।

৫। মনিটরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৬। সিস্টেম ইউনিট ও মাদারবোর্ড কী?

৭। কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।

৮। ডিজিটাল কম্পিউটার কত প্রকার ও কী কী?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

১. ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কম্পিউটার আবিষ্কারক। তিনি ১৯৩৩ সালে কম্পিউটার আবিষ্কার করেন।

২. কম্পিউটার শব্দটি গ্রীক শব্দ Compute থেকে উৎপত্তি।

৩. গণনাকারী যন্ত্র।

পর্ব-খ

১। সিপিইউ, মনিটর, ইনপুট ও আউটপুট ইউনিট।

২। সিপিইউ

৩। তথ্য ও উপাত্ত দেখায়

৪। মেমরি

পর্ব-গ

১। গাণিতিক ও শিক্ষামূলক কাজ করা যায়।

২। তিন প্রকার

৩। চার প্রকার,

পর্ব-ঘ

নির্ভুল কর্ম সম্পাদন, দ্রুতগতি, মেমরি, সূক্ষ্মতা, যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত, স্বয়ংক্রিয় কর্মক্ষমতা এবং সহনশীলতা।

ব্যবহারিক কাজ ০১: কম্পিউটারের প্রধান অংশগুলো সনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনারা ল্যাব ক্লাশে স্থাপিত কম্পিউটারের কাছে আসুন। ভালভাবে কম্পিউটারটি পর্যবেক্ষণ করুন। হাত দিয়ে স্পর্শ করে এর বিভিন্ন উপকরণাদির সাথে পরিচিত হউন। অত:পর কম্পিউটারের প্রধান অংশসমূহ চিহ্নিত করে খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং আপনার শ্রেণী শিক্ষককে মূল্যায়নের জন্য জমা দিন।

চিএ ঃ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ।

১) সিপিউ
২) মনিটর
৩) কীবোর্ড
৪) মাউস
৫) সিডি ড্রাইভ
৬) সিডি ড্রাইভ লাইট
৭) পাওয়ার অন লাইট
৮) রিসেট
৯) ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ
১০) সংযুক্ত ক্যাবল বা টারব লাইন
১১) হার্ড ডিস্ক বাতি
১২) প্রিন্টার
১৩) স্পীকার

ইউনিট ১ **অধিবেশন ২**

কীবোর্ড-এর বিন্যাস এবং কীবোর্ড ও মাউসের ব্যবহার

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী! কম্পিউটারে তথ্য ও উপাত্ত প্রবিষ্ট করার জন্য এক ধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হয়। এ উপকরণ ছাড়া কোন কিছু লেখা বা কম্পিউটারে কিছু ইনপুট দেয়া যায় না। টাইপ রাইটার মেশিনের সাহায্যে যেমন কোন কিছু লেখা বা কম্পোজ করা যায়। ঠিক তেমনী কীবোর্ড দিয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে কোন কিছু কম্পোজ করা যায়। তাই কী বোর্ডের সাথে পরিচিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। এ অধিবেশনে আমরা কীবোর্ড-এর সাথে পরিচিতি লাভ করব এবং এর ব্যবহার শিখব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- কীবোর্ড-এর বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে এবং কীবোর্ডের ব্যবহার শিখতে পারবেন।
- মাউস পরিচিতি লাভসহ ব্যবহার শিখতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ কীবোর্ড পরিচিতি ও এর বিন্যাস এবং কীবোর্ডের ব্যবহার

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটারের অভ্যন্তরে যে যন্ত্র বা উপকরণ দ্বারা তথ্য, উপাত্ত ইত্যাদি প্রবিষ্ট করানো হয় তাই ইনপুট ডিভাইস হিসেবে পরিচিত। **কীবোর্ড** এক প্রকার ইনপুট ডিভাইস এবং কীবোর্ডের সাহায্যে সবচেয়ে বেশি ডেটা, তথ্য কম্পিউটারে প্রবিষ্ট করানো হয়। তাই কীবোর্ড বহুল ব্যবহৃত **ইনপুট ডিভাইস**। বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার কীবোর্ড-এর পাঁচ ধরনের কী বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : অপারেশন কী, কার্সর কী, ফাংশন কী, কন্ট্রোল কী, নিউমেরিক কী প্যাড।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এখন নিচের ছক পূরণ করি।

১। কীবোর্ড হলো	
২। কীবোর্ড এর গুরুত্বপূর্ণ কী হলো	
৩। কীবোর্ডের কাজ হলো	

পর্ব-খ ঃ মাউস পরিচিতি ও মাউসের ব্যবহার

উইন্ডোজ চালিত সফটওয়ার উদ্ভাবনের ফলে মাউস এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই মাউস ব্যবহার করে কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য প্রবিস্ট করানোতে পারদর্শি হয়ে উঠেছেন। মাউস একটি ইনপুট ডিভাইস এবং ইনপুট ডিভাইস হিসেবে মাউসের ব্যবহার বাড়ছে। মাউস দিয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মাউস দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তিন ধরনের অপারেশন সম্পন্ন করতে হয়। প্রতি অপারেশনকে আমরা 'ক্লিক' বলে অভিহিত করে থাকি। যেমন: লেফট ক্লিক, রাইট ক্লিক এবং ডাবল ক্লিক। আরও একটি অপারেশন আছে তা হলো মাউস 'ড্রাগ'।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এখন নিচের ছক পূরণ করি।

১। মাউস হলো	
২। মাউসের এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো	
৩। মাউস দিয়ে কাজ করার সময় কতগুলো অপারেশন সম্পন্ন করি তা হলো	

ব্যবহারিক কাজ- ০২ : কী বোর্ড ও মাউস পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহার।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

কীবোর্ড-এর বিন্যাস এবং কীবোর্ড ও মাউসের ব্যবহার

কীবোর্ড কী ?

কী বোর্ড কম্পিউটারের একটি ইনপুট ডিভাইস। প্রিয় শিক্ষার্থী! কম্পিউটারে তথ্য, উপাত্ত এবং বর্ণ প্রবিস্ট করানোর জন্য কী বোর্ড ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি টাইপ রাইটার-এর মতো কীসহ অতিরিক্ত আরও কয়েকটি কী (Key) বিশিষ্ট উপকরণটিকে কী বোর্ড বলে। বর্তমানে ১১২ টি চাবি সম্বলিত কী বোর্ড-ই বহুল প্রচলিত।

কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইসগুলোর মধ্যে কীবোর্ড হচ্ছে অন্যতম। বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারের কীর্বোডে বিভিন্ন ধরনের কী রয়েছে । যেমনঃ অপারেশন কী, কার্সর কী, ফাংশন কী, কন্ট্রোল কী এবং নিউমেরিক কীপ্যাড। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! বিভিন্ন কী সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

অপারেশন কী ঃ কীবোর্ডের মাঝামাঝি অবস্থিত A, B, C,..... ১, ২, ...,!, #... ইত্যাদি মুদ্রিত কী-সমূহ অপারেশন কী নামে পরিচিত। লিপি প্রস্তুতকরণ কাজ অপারেশন কী-সমূহের অন্যতম ব্যবহার। কীবোর্ডে অপারেশন কী-গুলোর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি এবং তথ্য প্রবেশের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়।

কার্সর কী ঃ কার্সর নিয়ন্ত্রণের জন্য কীবোর্ডের ডান দিকের নিম্নাংশে সন্নিবেশিত তীর চিহ্নযুক্ত কীগুলোকে কার্সর কী বলা হয়। কার্সর কী-গুলোর মাধ্যমে কার্সর নিয়ন্ত্রণ করে মনিটরের পর্দায় কাজের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। কার্সরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে বিভিন্ন দিকে স্থানান্তর করতে এ কী-গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ Left (←), Right (→), Up (↑) ও Down (↓) প্রভৃতি এ্যরো কী-র সাহায্যে কার্সর যথাক্রমে বাম, ডান, উপরে ও নিচের দিকে স্থানান্তর করা যায়। PgUp, PgDn কীগুলোর সাহায্যে কার্সরকে এক পাতা উপরে বা নিচে নেয়া যায়। Home এবং End কী ব্যবহার করে কার্সর লাইনের প্রথমে বা শেষে এবং Ctrl + Home এবং Ctrl+End কী ব্যবহার করে কার্সর ডকুমেন্টের একদম প্রথমে বা শেষে নেয়া যায়।

ফাংশন কী ঃ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারের কীবোর্ডের বাম পাশের ওপরের সন্নিবেশিত F1, F2,...., F12 নম্বরযুক্ত কীগুলোকে ফাংশন কী বলা হয়। বার বার করতে হয় এমন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য ফাংশন কীগুলো ব্যবহৃত হয়। ফাংশন কীগুলোর মাধ্যমে তথ্য সংযোজন, বিয়োজন, সম্পাদনার কাজসহ মেনুর বিভিন্ন কমান্ড বা অপশন নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন প্যাকেজে ফাংশন কীগুলোর ব্যবহার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

কন্ট্রোল কী ঃ কীবোর্ডের মাধ্যমে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ প্রদানের জন্য কন্ট্রোল কীসমূহ ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল কীসমূহের মধ্যে এন্টার কী, কন্ট্রোল কী, অল্টার কী, শিফ্ট কী, ইস্কেপ কী ইত্যাদি অন্যতম।

স্পেসবার ঃ কীবোর্ডের নিচের সারিতে অবস্থিত সবচেয়ে লম্বা কী-টিকে স্পেসবার বলা হয়। লেখার সময় দুটি ক্যারেক্টার বা শব্দের মাঝে ফাঁকা স্থান রাখার জন্য স্পেসবার ব্যবহৃত হয়। প্রতিবার স্পেসবার চাপলে কার্সর এক অক্ষর ডান দিকে যায়। যদি কোন লেখার মাঝে কার্সর রেখে স্পেসবার চাপা যায় তবে লেখাসমূহ ডান দিকে সরতে থাকে।

এন্টার কী ঃ কীবোর্ডে সাধারণত দুটি এন্টার কী থাকে। একটি মাঝামাঝি অবস্থানের একটু ডান দিকে এবং অন্যটি কীবোর্ডের নিচের সারির ডান কোণে। যে কোন কমান্ড নির্বাচন করে তা বাস্তবায়নের জন্য মাউস ক্লিকের পরিবর্তে কীবোর্ডের এন্টার কী ব্যবহার করা হয়। আবার লেখার সময় এক লাইন থেকে পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য এন্টার কী ব্যবহার করতে হয়।

নিউমেরিক কীপ্যাড ঃ কীবোর্ডের ডান দিকে অবস্থিত ক্যালকুলেটরের মতো ১৭ থেকে ১৮ টি কীসম্বলিত অংশকে নিউমেরিক কী প্যাড বলা হয়। পরিসংখ্যান ও গণিত বিষয়ক কাজের জন্য নিউমেরিক কী প্যাড ব্যবহার সুবিধাজনক। নিউমেরিক কী প্যাডের উপরের বাম পাশে অবস্থিত Num Lock লেখাযুক্ত কী-টি অফ ও অন করে নিউমেরিক কীপ্যাড অধিকাংশ কী দ্বৈত কাজে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ Num Lock কী অন করে রাখলে গাণিতিক ফাংশনগুলো কাজ করে, আবার Num Lock কী বন্ধ থাকলে নিউমেরিক কীসমূহের নিচে যা লেখা রয়েছে সেগুলো কাজ করবে। যেমন, 7 লেখা কী-টির নিচে Home লেখা রয়েছে। Num Lock কী চালু থাকলে এটি চাপলে 7 লেখা হবে। আবার Num Lock কী বন্ধ থাকলে এটি চাপলে কার্সর লাইনের শেষে স্থানান্তরিত হবে।

চিত্র ঃ কীবোর্ডের বিভিন্ন কী ।

নাম লক

কী বোর্ডের ব্যবহার

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কী বোর্ড-এর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। যেমন, কম্পিউটারে কী বোর্ডের বোতামের সাহায্যে টাইপ করা ছাড়াও কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নির্দেশ প্রদান করা যায়। কী বোর্ডের সাহায্যে অক্ষর বা বর্ণ ও সংখ্যাসহ বিভিন্ন প্রকার টাইপের মাধ্যমে তথ্য, উপাত্ত কম্পিউটারে প্রবিস্ট করা হয়।

মাউস কি?

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! একটু আগেই আমরা মাউস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছি। আসুন বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। মাউস হলো কম্পিউটারের একটি ইনপুট ডিভাইস। কী বোর্ডে এক বা একাধিক বার চেপে সহজেই লেখালেখিসহ কম্পিউটারে বিভিন্ন কমান্ড দেয়া যায়। আবার একই কাজ মাউস ক্লিক ও মাউস ড্রাগ করে মাউসের সাহায্যে করা যায়। ডেস্কটপ বা প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় অবস্থানে মাউস পয়েন্টার রেখে আঙ্গুল দ্বারা মাউসের বোতামে হাত চাপ দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। মাউস পয়েন্টার যেখানে থাকে মাউস ক্লিক সেখানে কার্যকরী হয়। মাউস ক্লিক তিন প্রকারের। যথা ঃ লেফট, রাইট ও ডাবল ক্লিক।

লেফট ক্লিক ঃ কোন আইটেমের উপর মাউস পয়েন্টার রেখে মাউসের বাম বোতামে একবার চাপ দেয়াকে লেফট ক্লিক বলা হয়। মাউস ক্লিক বলতে সাধারণত লেফট ক্লিকই বুঝায়। একে সিঙ্গেল ক্লিক ও বলা হয়।

রাইট ক্লিক ঃ কোন আইটেমের উপর মাউস পয়েন্টার রেখে মাউসের ডান বোতামে একবার চাপ দেয়াকে রাইট ক্লিক বলা হয়। মাউসের দ্বারা করণীয় অনেক কাজ সংক্ষিপ্তভাবে সম্পাদনের জন্য রাইট ক্লিক করা হয়।

ডাবল ক্লিক ঃ কোন ফাইল বা ডিরেক্টরী আইটেমের উপর মাউস পয়েন্টার রেখে ঘনঘন দুবার চাপ দেয়াকে ডাবল-ক্লিক্ বলে। সাধারণত কোন নির্দেশনা প্রয়োগ কিংবা প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য ডাবল-ক্লিক্ করা হয়।

মাউস ড্রাগ ঃ মাউসের বামপাশের বোতাম চেপে ধরে নির্বাচিত আইটেম এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়াকে ড্রাগ করা বলে।

চিত্রঃ একটি মাউসের বিভিন্ন অংশ।

মাউসের ব্যবহার

বর্তমানে উইন্ডোজ চালিত সফটওয়ারসমূহ কী বোর্ডের পাশাপাশি মাউস দিয়ে তথ্য প্রবিষ্ট করা সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করতে সহায়তা করে। কী বোর্ডের বিকল্পরূপে মাউস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মূল্যায়নঃ

১। কীবোর্ড কাকে বলে? কী বোর্ডে সকল কী গুলোর নাম খাতায় লিখুন।

২। মাউস কী? মাউসের অপারেশন বর্ণনা কর।

৩। কীবোর্ড ও মাউসের ব্যবহার লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

১। ইনপুট ডিভাইস

২। অপারেশন কী

৩। তথ্য উপাত্ত কম্পিটারে প্রবিস্ট করান।

পর্ব-খ

১। বাম বোতাম, ডান বোতাম সংযোগ তার, মাউস প্যাড।

ব্যবহারিক কাজ ০২ : কী বোর্ড ও মাউস পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহার শিখন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা নিম্নলিখিত ধাপসমূহ সম্পন্ন করে কাজটি অনুসরণ করুন।

- কীবোর্ড হাতে ধরে বিভিন্ন কী-এর সাথে পরিচিত হউন। আংগুলের সাহায্যে চাপ দিয়ে কীগুলোর কার্যকারীতা লক্ষ্য করুন।
- ঠিক একইভাবে মাউসে হাত দিয়ে এর কার্যকারীতা লক্ষ্য করুন এবং কার্সর নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুশীলন করুন।
- কোন কিছু লেখার জন্য উইন্ডো তৈরি করুন। এ ক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষকের সাহায্য নিন।
- বিভিন্ন কী ব্যবহার করে আপনার নাম ঠিকানা লিখে তা শ্রেণী শিক্ষককে দেখান।
- এবার মাউস হতে নিয়ে চালনার অনুশীলন করুন।
- মাউসের লেফ্ট ও রাইট বাটন চাপ দিয়ে এর কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করুন।
- সবশেষে মাউস ড্রাগ করা অনুশীলন করুন এবং কার্সরের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৩**

কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করা

ভূমিকা

শিক্ষার্থী! একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার প্রতিটি ধাপ খুবই সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। আলোচ্য অধিবেশনে কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করা নিয়ম এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- কম্পিউটার চালু করার নিয়ম শিখবেন এবং
- কম্পিউটার বন্ধ করার নিয়ম শিখতে পারবেন।

পর্বসমূহ
পর্ব-কঃ কম্পিউটার চালু করা

শিক্ষার্থী! একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য কম্পিউটার চালু করা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য কম্পিউটার চালু করার প্রতিটি ধাপ খুবই সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। কম্পিউটারে কাজ শুরু করতে হলে বিদ্যুৎ সাপ্লাই সুইচ চালু করা এবং স্ট্যাবিলাইজার অথবা ইউপি্এস চালু থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার সিস্টেম ইউনিট ও মনিটর চালু করা এবং উইন্ডোজ চালিত সিস্টেম বুটিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ইত্যাদি কাজগুলো সম্পন্ন করতে হয়। বর্তমানে ডস অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করা হয় না। এখন দেশে Windows 2000 বা Windows-XP-Professional অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করা হয়। Windows 2000 বা Windows-XP Professional স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। কম্পিউটার হার্ডডিস্কে Windows 2000 বা Windows-XP Professional বিদ্যমান থাকলে কম্পিউটার চালু করার পর কম্পিউটারের মনিটর জুড়ে Windows 2000 অথবা Windows-XP Professional-এর প্রতীক বা লগো কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে মিলে যাবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী ! আসুন আমরা কম্পিউটার চালু করার ধাপগুলো ছক আকারে লিপিবদ্ধ করি।

কম্পিউটার চালু করার ধাপসমূহ

পর্ব-খ ঃ কম্পিউটার বন্ধ করা

শিক্ষার্থী! একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য কম্পিউটার বন্ধ করা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য কম্পিউটার বন্ধ করার প্রতিটি ধাপ খুবই সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। কম্পিউটারে কাজ সম্পাদন করে বন্ধ করতে চাইলে নিয়ম মেনে কম্পিউটার বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনারা যদি উইন্ডোজ -এ কাজ সম্পন্ন করে বন্ধ করতে চান তাহলে উইন্ডোজ বন্ধ করে Shut down এর মাধ্যমে সিস্টেম বন্ধ করা প্রয়োজন। তারপর ইউপি্এস, স্ট্যাবিলাইজারসহ বিদ্যুৎ সাপ্লাই সুইচ ধাপে ধাপে বন্ধ করতে হবে। সবশেষে মনিটর বন্ধ করতে হবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী ! আসুন আমরা কম্পিউটার বন্ধ করার ধাপগুলো ছক আকারে লিপিবদ্ধ করি।

কম্পিউটার বন্ধ করার ধাপসমূহ

ব্যবহারিক কাজ ০৩ : কম্পিউটার চালু ও বন্ধকরণ অনুশীলন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! সঠিকভাবে কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করা প্রত্যেক ব্যবহারকারীর উচিত। তা না হলে কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিবে। এ বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

কম্পিউটার চালু করা ঃ উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক কম্পিউটার চালু করার জন্য প্রথমে কম্পিউটার-এর বিভিন্ন অংশসমূহ সঠিকভাবে সংযুক্ত এবং কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে কিনা দেখতে হয়। অতঃপর সিস্টেম বক্সের পাওয়ার বাটন বা সুইচ টিপে কম্পিউটার চালু করতে হয়। তারপর মনিটর চালু করতে হয়। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক কম্পিউটার চালু করলে কিছুক্ষণ পরে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মনিটরের স্ক্রীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেস্কটপ উইন্ডো দেখতে পাওয়া যায়।

এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালু করাঃ ডেস্কটপ টাস্কবারের নিচে বাম প্রান্তে মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজের মনোগ্রাম সম্বলিত Start লেখা একটি বাটন থাকে। এ বাটনে ক্লিক করলে কিংবা কী-বোর্ড থেকে Ctrl+Esc কী-দ্বয় একত্রে চাপলে Start মেনু প্রদর্শিত হয়। কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করাসহ যে কোন প্রোগ্রাম চালু করার জন্য Start মেনু ব্যবহৃত হয়। স্টার্ট মেনুর Programs বা All Programs লিখিত মেনুতে কম্পিউটারে চালনাযোগ্য উইন্ডোজভিত্তিক সকল প্রোগ্রামের তালিকা থাকে। তালিকা থেকে কোন প্রোগ্রাম নির্বাচন করলে প্রোগ্রামটি চালু হয়। আবার এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে কাজ শেষ হলে কাজটি সেভ করে বের হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের File মেনু থেকে Exit এ ক্লিক্ করতে হয় অথবা Alt+F4 কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে।

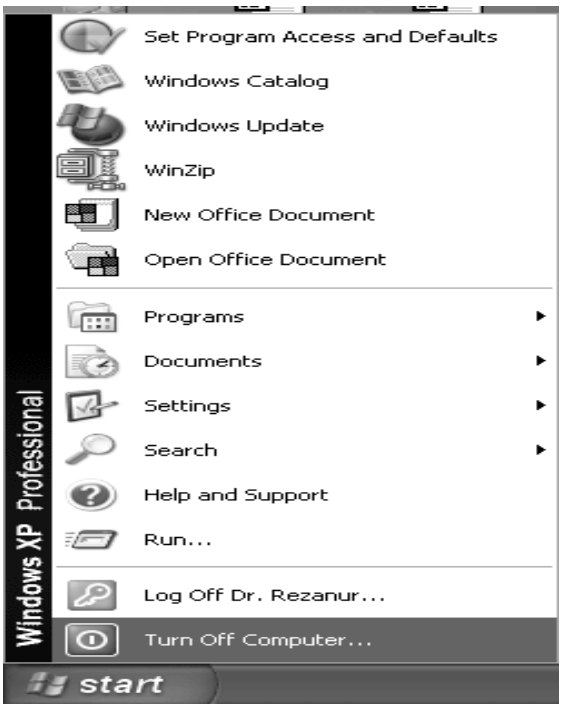

চিত্রঃ Start উইন্ডো।

মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড চালু করা

মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড (Microsoft Word), সংক্ষেপে এমএস ওয়ার্ড (MS Word) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম। এটি ব্যবহার করে সহজেই ডকুমেন্ট তৈরিকরণ, সংরক্ষণ, বানান ও ব্যাকরণ জনিত ভুল সংশোধন, লেখা ছোট-বড় করা, বিভিন্ন ভাষা, ফন্ট ও আঙ্গিকে লিখন, চিত্র অঙ্কন, বিভিন্ন মাপের কাগজে মুদ্রণ প্রভৃতি কাজ করা যায়।

মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড প্রোগ্রাম চালু করার জন্য স্টার্টবার থেকে Programs এবং Programs থেকে Microsoft Word নির্বাচন করে এন্টার কী চাপতে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হলে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড প্রোগ্রাম চালু হয়।

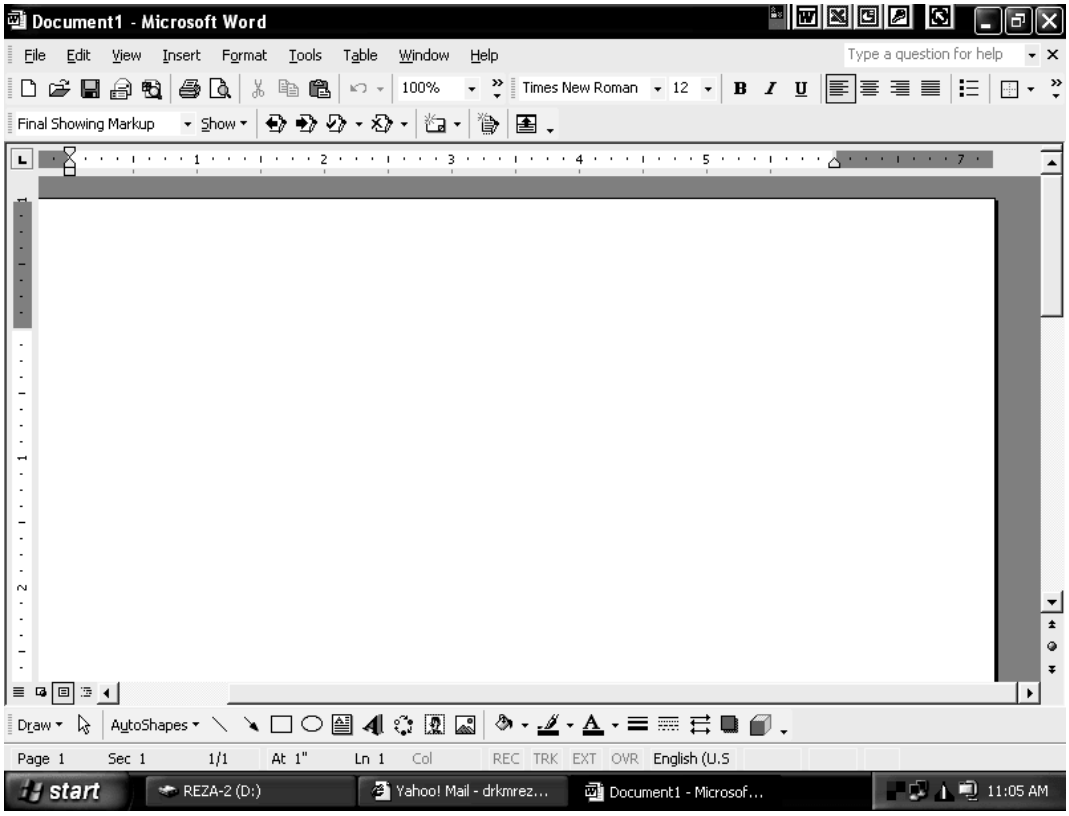

চিত্র: একটি খালি উইন্ডো।

অপারেটিং সিস্টেম কী?

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে একগুচ্ছ প্রোগ্রামের সমাহার যা ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাধারণ কার্যক্রমসমূহ ব্যবস্থাপনা করা হয়। পূর্বে অপারেটিং সিস্টেম বলতে ডসকেই (DOS) বোঝানো হত। বর্তমানে উইন্ডোজভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমই সর্ব গ্রহণযোগ্য। তবে, এ অপারেটিং সিস্টেমের অভ্যন্তরে ডস্ ব্যবহৃত হয়। যেহেতু, ডস্ একটি ডিস্ক ভিত্তিক সিস্টেম সফট্ওয়্যার তাই একে Disk Operating System বলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! ডস্-এর অভ্যন্তরে প্রোগ্রামসমূহ কম্পিউটারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ডসই কম্পিউটারকে বলে দেয় ডিস্কে কীভাবে ফাইলসমূহ স্থাপিত, প্রতিস্থাপিত, লিখিত, পঠিত ইত্যাদি হবে। ডিস্কে সংরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা ডসই করে থাকে। কম্পিউটার সিস্টেম অন্য সফট্ওয়্যারসমূহকে কীভাবে চালনা করবে তার কিছুটাও ডস্ নিয়ন্ত্রণ করে। উইন্ডোজভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম হলেও তার অভ্যন্তরে উইন্ডোজ চালিত ডস্ বিদ্যমান আছে এবং সেটাই কম্পিউটারকে ফাইলসমূহের সঠিক ব্যবহার, লিখন, পঠন এবং ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে।

শিক্ষার্থী! মনে রাখবেন যে, একটা কম্পিউটার চালু করতে ROM BIOS -এ সংযুক্ত প্রোগ্রাম ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম আবশ্যক। আর তা উইন্ডোজ বা ডস্ ভিত্তিক যে সিস্টেমেই হোক না কেন অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার চালু করে কাজ করা যাবে না। অপারেটিং সিস্টেম এর অভ্যন্তরে ডস্ ব্যবহার হয়। ফ্লপি ড্রাইভেও কম্পিউটার চালু করা যায়, যদি ঐ ডিস্কে IO.SYS, MSDOS.SYS ও COMMAND.COM এ তিন ফাইল থাকে। হার্ডডিস্কের রুট ড্রাইভে আগে থেকেই ফাইল তিনটি রেখে দেবার ফলে কম্পিউটার চালু করলেই C:\> পাওয়া যায়।

বর্তমানে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এ বেশি কাজ হয়। উইন্ডোজ বা Windows-XP-Professional একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। কম্পিউটার হার্ডডিস্কে উইন্ডোজের যেকোন ভার্সন বা Windows-XP-Professional বিদ্যমান থাকলে কম্পিউটার অন করার পর কম্পিউটারের পর্দায় বা মনিটর জুড়ে উইন্ডোজ-৯৮ বা ২০০০ অথবা Windows XP Professional এর প্রতীক বা লগো কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে মিলে যাবে। তারপরই কম্পিউটার কোন কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মনে রাখবেন যে, একটি পরীক্ষিত ও গতিশীল অপারেটিং সিস্টেম ব্যতীত কম্পিউটার চালু করা এবং ব্যবহারিক কাজ করা যায় না।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ফ্লপি ড্রাইভে কম্পিউটার চালুকরণ ধাপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

১. একটি ডস্ যুক্ত (Bootable) ডিস্কেট A ড্রাইভে প্রবেশ করান।

২. সিস্টেম ইউনিটের পাওয়ার সুইচ অন্ করুন।

৩. মনিটরের পাওয়ার সুইচ চালু করুন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

A:\> ভাসবে, এখানে A হচ্ছে ড্রাইভের নাম, > হচ্ছে প্রম্পট (Prompt) এবং মিটমিট করা - হচ্ছে কারসার (Cursor)।

আবার, হার্ডডিস্কে ড্রাইভ যুক্ত কম্পিউটার চালুকরণ ধাপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

১. যেহেতু হার্ড ডিস্কে পূর্বেই ডস্-এর ফাইল তিনটি রয়ে গেছে, তাই প্রথমেই সিস্টেম ইউনিট চালু করুন।

২. পরে মনিটরকে চালু করুন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

C:\> ভাসবে। অর্থাৎ কম্পিউটার হার্ডডিস্কে চালু করা হলো। তবে, উইন্ডোস চালিত অপারেটিং সিস্টেম থাকলে একটা মেনু ভাসবে এবং বেশ কিছু আইকন ভাসবে পর্দায় এবং ঐ মেনু অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ফ্লপি ড্রাইভকে ডস্যুক্ত Bootable তৈরি করার পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১. একটি ডস সম্বলিত হার্ডডিস্ক সংযুক্ত কম্পিউটার চালু করুন এবং

Format A:/ লিখে এন্টার চাপ দিন।

Insert new diskette for drive A and Press any key when ready..... ভাসবে।

২. একটি নতুন ডিস্কেট ড্রাইভটিতে প্রবিস্ট করার পর .. দিন। পর্দায় ভাসবে,

Formating ...

Formating Complete

System Transferred

Format another (Y/N) ?। এখানে N চাপুন। A ড্রাইভে রক্ষিত ডিস্কেটটি বুটেবল হয়ে গেছে।

হার্ড ডিস্ককে বুর্টেবল করার পদ্ধতি নিম্নরূপ

১. একটি ডস্ ডিস্কেট A ড্রাইভে রেখে কম্পিউটার চালু করুন।

২. format C:/ লিখে এন্টার চাপ দিন।

৩. পর্দায় ভাসবে Warning: All data will be lost in drive C ..... proceed with format (Y/N)

৪. এখানে Y লিখে এন্টার চাপ দিন।

বর্তমানে উইন্ডোজভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম-এ বিদ্যমান মেনুর সাহায্যে উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

কম্পিউটার বন্ধ করা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক কম্পিউটার বন্ধ করার জন্য প্রথমে সব খোলা প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হবে। অতপর Start বার থেকে Shut Down মেনু নির্বাচন করে প্রাপ্ত Shut Down Windows ডায়ালগ বক্সে Shut Down অপশন নির্বাচন করে OK বাটন কিংবা এন্টার কী চাপতে হয়। এভাবে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়। অন্যথায় সিস্টেম ইউনিটের বক্সে পাওয়ার বাটন বা সুইচ টিপে কম্পিউটার বন্ধ করতে হয়। তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনারা এভাবে কম্পিটার বন্ধ করবেন না। কারণ এতে কম্পিউটারের ক্ষতি হয়। পাওয়ার সমস্যার কারণে কম্পিউটার যে কোন উপকরণ অকেজো হয়ে যেতে পারে। ফলে কম্পিউটার স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই সঠিক উপায়ে এবং নিয়ম মেনে কম্পিউটার বন্ধ করুন।

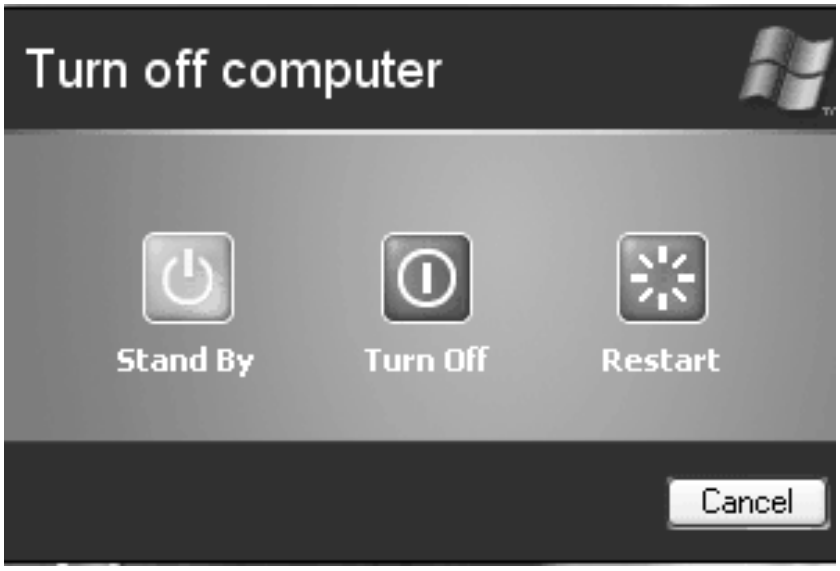

চিত্র: কম্পিউটার Shut Down Window.

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার ধাপগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

নিচে ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি কম্পিউটারকে চালু করা যায়।

- বিদ্যুত সাপ্লাই সুইচ অন করতে হবে।
- স্ট্যাবিলাইজার বা ইউপিএস চালু করা।
- কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট চালু করা।
- মনিটর অন করা।
- পাসওয়ার্ড দেয়া থাকলে তা লিখে ENTER/OK কী চাপ দিতে হবে।
- তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।
- উইন্ডোজ চালিত সিস্টেম মেনু ভেসে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
- কিছুক্ষণের মধ্যেই চাহিদা মাফিক সফটওয়ারে কাজ করার জন্য কম্পিউটার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবে।

আবার নিচের পর্যায় ক্রমিক কাজগুলো সম্পন্ন করে একটি কম্পিউটার বন্ধ করা যায়।

- প্রথমে ব্যবহৃত সব প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হয়।
- কম্পিউটার START মেনু থেকে Shut down করতে হবে।
- সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
- কোন কোন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সিস্টেম ইউনিট বন্ধ করতে হবে।
- কাজ শেষে মনিটর বন্ধ করতে হবে।
- ইউপিএস বন্ধ করা।
- পরে ভোলটেজ স্ট্যাবিলাইজার থাকলে বন্ধ করতে হবে।

- সবশেষে বিদ্যুৎ সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করতে হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটার বন্ধ করার জন্য অবশ্যই উপরোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করুন। হটাৎ করে কম্পিউটার বন্ধ করবেন না। এতে করে সিস্টেমের কার্যক্ষমতা হারায় এবং কম্পিউটারে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১। কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার নিয়মগুলোর বর্ণনা করুন।

২। কম্পিউটার হটাৎ করে বন্ধ করলে কী ক্ষতি হতে পারে?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

- বিদ্যুত সাপ্লাই সুইচ অন করতে হবে।
- স্ট্যাবিলাইজার বা ইউপিএস চালু করা।
- কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট চালু করা।
- মনিটর অন করা।
- পাসওয়ার্ড দেয়া থাকলে তা লিখে ENTER/OK কী চাপ দিতে হবে।
- তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।
- উইন্ডোজ চালিত সিস্টেম মেনু ভেসে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
- কিছুক্ষণের মধ্যেই চাহিদা মাফিক সফটওয়ারে কাজ করার জন্য কম্পিউটার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবে।

পর্ব-খ

- প্রথমে ব্যবহৃত সব প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হয়।
- কম্পিউটার START মেনু থেকে Shut down করতে হবে।
- সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
- কোন কোন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সিস্টেম ইউনিট বন্ধ করতে হবে।
- কাজ শেষে মনিটর বন্ধ করতে হবে।
- ইউপিএস বন্ধ করা।
- পরে ভোলটেজ স্ট্যাবিলাইজার থাকলে বন্ধ করতে হবে।

- সবশেষে বিদ্যুত সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করতে হবে।

ব্যবহারিক কাজ ০৩ : কম্পিউটার চালু ও বন্ধকরণ পর্যবেক্ষণ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনারা ল্যাব ক্লাশে স্থাপিত কম্পিউটারের কাছে আসুন। অত:পর কম্পিউটার খোলা ও বন্ধ করার অনুশীলন করুন। এ ধাপগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং আপনার শ্রেণী শিক্ষককে মূল্যায়নের জন্য জমা দিন।

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি কম্পিউটারকে চালু করা যায়।

- বিদ্যুত সাপ্লাই সুইচ অন করতে হবে।
- স্ট্যাবিলাইজার বা ইউপিএস চালু করা।
- কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট চালু করা।
- মনিটর অন করা।
- পাসওয়ার্ড দেয়া থাকলে তা লিখে ENTER/OK কী চাপ দিতে হবে।
- তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।
- উইন্ডোজ চালিত সিস্টেম মেনু ভেসে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
- কিছুক্ষণের মধ্যেই চাহিদা মাফিক সফটওয়ারে কাজ করার জন্য কম্পিউটার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবে।

আবার নিচের পর্যায় ক্রমিক কাজগুলো সম্পন্ন করে একটি কম্পিউটার বন্ধ করা যায়।

- প্রথমে ব্যবহৃত সব প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হয়।
- কম্পিউটার START মেনু থেকে Shut down করতে হবে।
- সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
- কোন কোন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সিস্টেম ইউনিট বন্ধ করতে হবে।
- কাজ শেষে মনিটর বন্ধ করতে হবে।
- ইউপিএস বন্ধ করা প্রয়োজন।
- পরে ভোলটেজ স্ট্যাবিলাইজার থাকলে বন্ধ করতে হবে।
- সবশেষে বিদ্যুত সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করতে হবে।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৪**

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী! কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। একটি শক্তিশালী বা অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার সমৃদ্ধ কম্পিউটারের সাথে ছোট ছোট বা কম ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোকম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। আলোচ্য অধিবেশনে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও এর টপোলজী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা ও গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে করবেন।
- কম্পিউটার টপোলজী সম্পর্কে বর্ণনা করতে করবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী! কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। যে বিশেষ ব্যবস্থায় ডেটা স্থানান্তর, ইলেকট্রোনিক মেইল প্রেরণ, ব্যাংকিং কাজ, টেলিকনফারেন্স প্রভৃতি কার্য পরিচালনার জন্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা টার্মিনালে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় সেই ব্যবস্থাকে **কম্পিউটার নেটওয়ার্ক** বলে। একটি শক্তিশালী বা অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার সমৃদ্ধ কম্পিউটারের সাথে ছোট ছোট বা কম ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোকম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। যা নিকটে হতে পারে, পাশাপাশি হতে পারে, এক শহর থেকে অন্য শহরে হতে পারে, এমনকি এক দেশ থেকে অন্য দেশও হতে পারে। নেটওয়ার্ক-কে তিন ভাগে ভাগ করা

যায়; যেমন- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এখন নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর জানতে চেষ্টা করি।

১) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?

২) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কত প্রকার ও কী কী?

পর্ব-খঃ কম্পিউটার টপোলজী

প্রিয় শিক্ষার্থী! কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপনের চার ধরনের টপোলজী সম্বন্ধে নিচে আমরা এখন আলোচনা করব।

- স্টার টপোলজী (Star topology)
- রিং টপোলজী (Ring topology)
- বাস টপোলজী (Bus Topology)
- ট্রি টপোলজী (Tree topology)

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আসুন এখন নিচে প্রশ্নটির উত্তর জানতে চেষ্টা করি।

১। টপোলজী কত প্রকার ও কী কী ?

২। বাস টপোলজী কী?

৩। বাস টপোলজীর সুবিধা কী?

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network) কী?

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত একাধিক কম্পিউটার যখন আন্ত:সংযোগের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে তখন সম্পূর্ণ সিস্টেমকে কম্পিউটার **নেটওয়ার্ক** বলা হয়। তামার তার, অপটিক্যাল ফাইবার, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি আন্ত:সংযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব মাধ্যম দিয়ে তথ্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে সঞ্চালিত হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত প্রতিটি কম্পিউটারই একটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার হিসেবে কাজ করতে পারে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

ক) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network) ।

খ) মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network) ।

গ) ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network) ।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

একটি ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে যেমন- একটি রুম বা একটি বিল্ডিং এর কয়েকটি রুম অথবা কয়েকটি বিল্ডিংয়ে অবস্থিত কম্পিউটারসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য যে নেটওয়ার্ক বা সংযোগ গড়ে তোলা হয় তাকে লোকাল **এরিয়া নেটওয়ার্ক** বলা হয়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটারসমূহ ডিজিটাল ডাটা আদান প্রদান করতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে 'ফাইল সার্ভার', 'প্রিন্ট সার্ভার', 'কমিউনিকেশন সার্ভার' থাকে। ছোট অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে সাধারণত নিম্নলিখিত চার ধরনের সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়; যথা-

- স্টার টপোলজি (Star Topology)
- রিং টপোলজি (Ring Topology)
- বাস টপোলজি (Bus Topology)
- ট্রি টপোলজি (Tree Topology)

স্টার টপোলজি

স্টার টপোলজি বা স্টার সংগঠনে কম্পিউটারসমূহ একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি কম্পিউটার কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্য কম্পিউটারে সংকেত পাঠাতে পারে। কেন্দ্রীয় কম্পিউটারটি এক্ষেত্রে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় কম্পিউটারটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটি বিকল হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন কম্পিউটার বিকল হলেও নেটওয়ার্কের অন্য অংশের কাজে অসুবিধা হয় না।

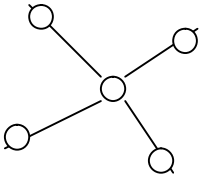

স্টার টপোলজি

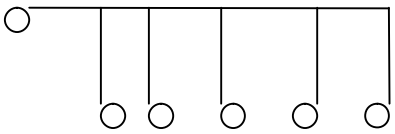

বাস টপোলজি

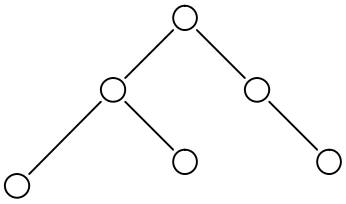

ট্রি টপোলজি

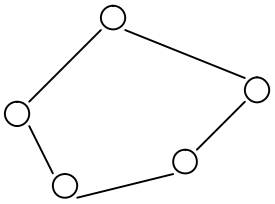

রিং টপোলজি

চিএঃ বিভিন্ন ধরনের টপোলজি।

রিং টপোলজি

রিং টপোলজি বা রিং সংগঠনে কম্পিউটারসমূহ নোডের মাধ্যমে পরিবহন বাসে বৃত্তাকারে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। কোন কম্পিউটার সংকেত পাঠালে তা পরবর্তী কম্পিউটার গ্রহণ করে এবং পরবর্তী নোডের দিকে প্রবাহিত করে। এভাবে তথ্যের একমুখী প্রবাহ বৃত্তাকার পথে হয়ে থাকে।

বাস টপোলজি

বাস টপোলজি বা বাস সংগঠনে কম্পিউটারগুলো নোডের মাধ্যমে একটি বাস বা সাধারণ পরিবহন মাধ্যমের সাথে সংযুক্ত থাকে। বাসের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারে সংকেত পাঠাতে পারে। প্রতিটি কম্পিউটারের আলাদাভাবে নোডের মাধ্যমে বাসের সাথে যুক্ত থাকে বলে নেটওয়ার্কে তথ্য পরিবহনে কোন ব্যঘাত সৃষ্টি করে না। নেটওয়ার্কের একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে তাকে সহজেই নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব।

ট্রি টপোলজি

ট্রি টপোলজি বা ট্রি সংগঠনে কম্পিউটারগুলো সরাসরি কেন্দ্রিয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে না। বরং কম্পিউটারসমূহ গাছের ন্যায় শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত থাকে। কম্পিউটারসমূহ উচ্চগতি সম্পন্ন সংযোগ পথ দ্বারা যুক্ত করা হয়।

মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের চেয়ে কিছুটা বৃহৎ ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে যে নেটওয়ার্ক থাকে তাকে **মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক** বলে। কয়েকটি বিল্ডিং থেকে শুরু করে একটি শহরে অবস্থিত বিভিন্ন কম্পিউটারসমূহের মধ্যে যে নেটওয়ার্ক বা সংযোগ গড়ে ওঠে তা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কের অন্তর্গত। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের তুলনায় এ ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য পরিবহনে ভুলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়।

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

বিশাল ভৌগলিক এলাকা যেমন- কয়েকটি শহর বা দেশ, মহাদেশের কম্পিউটারের মধ্যে যে সংযোগ বা নেটওয়ার্ক থাকে তাকে **ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক** বলে। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

এছাড়াও বিশেষ কাজের জন্য নিচের নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়।

- **সম্পূর্ণ পরস্পর সংযুক্ত নেটওয়ার্ক** (Fully Interconnected Network) : এক্ষেত্রে প্রত্যেক কম্পিউটার অন্য সব কম্পিউটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। এর সুবিধা হল যে কোন দুটি নোডের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত সংযোগ সাধন করা যায়। তাছাড়া একটি কম্পিউটার বা একটি সংযোগ লাইন খারাপ হয়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে অসুবিধা হল সংযোগ লাইনগুলোর মোট দৈর্ঘ্য খুব বেশি হওয়ায় খরচ বেশি হয়।

- **মাল্টিপয়েন্ট** (Multipoint) **নেটওয়ার্ক :** এ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় একটি সাধারণ সংযোগ লাইনের সঙ্গে সবগুলো নোড যুক্ত থাকে। এর প্রধান সুবিধা সংযোগ লাইনের খরচ কম হয়। এছাড়া একটি কম্পিউটার খারাপ হয়ে পড়লেও অন্যদের কাজ করতে কোন অসুবিধা হয় না।

- **টেলিমেটিক্স** (Telematics): টেলিকম্যুনিকেশন-এর(Tele-communication) টেলি ও ইনফমেটিক্স-এর (Informatics) মেটিকস যুক্ত হয়ে টেলিমেটিক্স শব্দটি গঠিত হয়েছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে দূর হতে প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময়, স্থানান্তর বা সংগ্রহ করা সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যাকে টেলিমেটিক্স বলে। তথ্য আহরণ, তথ্যের শ্রেণীবিভাগ, কপি তৈরি করা, সংরক্ষণ ইত্যাদি তথ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিদ্যাকে ইনফমেটিক্স বলে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটার না থাকলেও এ যোগাযোগ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা যায়। নেটওয়ার্কের বিভিন্ন নোডের মধ্যে যোগাযোগের জন্য সাধারণত চারটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পদ্ধতিগুলো হলো :

- **টেলিফোন** (Telephone) : যোগাযোগের উন্নত উপায় হিসেবে টেলিফোন ব্যবস্থা ডেটা ও কণ্ঠস্বর উভয় প্রকার তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। লিজড লাইন ও ডায়ালড লাইন দু'ভাবে এ কাজ করা যায়। এ ব্যবস্থায় টেলিফোন দ্বারা টার্মিনাল বা এক কম্পিউটারের সঙ্গে অন্য কম্পিউটারের সংযোগ করা যায়। টেলিফোনে ডিজিটাল সংকেত পাঠানোর গতিবেগ সাধারণত সেকেন্ডে

১২০০ বিট বা 1200 bps (bits per second), একে ১২০০ বাউডও (Bauds) লেখা হয়।

- **ফাইবার অপটিক কেবল** (Fibre Optic Cable) : লেজার রশ্মি এ ব্যবস্থার অন্যতম বাহক। এক্ষেত্রে কাঁচ বা প্লাষ্টিকের সূক্ষ্ম নলের (ফাইবার অপটিক কেবল) মধ্যে দিয়ে লেজার (Laser) রশ্মির বারবার প্রতিফলনের মাধ্যমে তথ্য পাঠানো হয়। এখানে গতিবেগ সাধারণত 2500 Mbps (Mbps = দশ লক্ষ bps)।
- **বেতার তরঙ্গ** (Radio Waves) : রেডিও, টিভিতে বেতার তরঙ্গ সংযোগের ন্যায় দুটো কম্পিউটারের মধ্যেও সংযোগ করা যায়। এক্ষেত্রে সংকেত প্রেরণের গতিবেগ মোটামুটি 24Kbps (Kilo bps)।
- **মাইক্রো-ওয়েভ** (Micro-wave) : বেতার তরঙ্গের মত মাইক্রো-ওয়েভ বাঁকতে পারে না। সে কারণে গ্রাহক ও প্রেরক কম্পিউটারের মধ্যে কোন বাধা থাকলে সংকেত পাঠানো যায় না। কম্পিউটার প্রদত্ত সংকেতকে উচ্চ কম্পাংক বিশিষ্ট মাইক্রো-ওয়েভ স্পন্দনে রূপান্তর করে প্রেরণ করে। তথ্য প্রেরিত হয়। বর্তমানে দ্রুত ঘূর্ণায়মান উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত সংকেতকে শক্তিশালী করে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে পাঠানো যায়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা! এ অসুবিধা দূর করার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হয়। এদের বলে সংযোগ উপগ্রহ (Communication Satelite)। এগুলো বিষুবরেখার ৩৬০০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে Geostationary orbit-এ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। Geostationary orbit ঘোরা মানে পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারপাশে আবর্তন গতির সমান গতিতে ঘোরা এবং এর ফলে পৃথিবী থেকে এদের স্থির মনে হয়।

মডেম (Modem) : যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রেরক কম্পিউটারের ডিজিটাল সংকেতকে (মডুলেশন প্রক্রিয়ায়) এনালগ সংকেতে এবং এনালগ সংকেতকে (ডিমডুলেশন প্রক্রিয়ায়) ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরের মাধ্যমে গ্রাহক কম্পিউটারে অত্যন্ত দ্রুত তথ্য প্রেরণ করা যায় সেই ব্যবস্থাকে **মডেম** বলে। মডেম শব্দটি মডুলেটর-ডিমডুলেট-এর (Modulator-demodulator) সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রেরক যন্ত্র থেকে মডুলেটিং পদ্ধতিতে সংকেত পাঠানো হয়। গ্রাহক যন্ত্র সে সংকেত ডিমডুলেটিং পদ্ধতিতে পৃথক করে কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী করে।

কম্যুনিকেশন প্রোটোকল (Communication Protocol) : কতগুলো টার্মিনাল বা কম্পিউটার যখন একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকে তখন তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও তথ্য চলাচল সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ নিয়মগুলোকে **কম্যুনিকেশন প্রোটোকল** বলে।

মূল্যায়ন :

১। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?

২। নেটওয়ার্ক কত প্রকার ও কী কী?

৩। টপোলজী কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন।

৪। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যোগায়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

২। তিন প্রকার; যথা–লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

পর্ব-খ

১। চার প্রকার; যথা– রিং, বাস, স্টার ও ট্রি টপোলজী।

৩। নেটওয়ার্কের একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে তাকে সহজেই নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব।